বাঙালি মুসলমানের স্মৃতি ও চর্চায় রামমোহন রায়

মোহাম্মদ আজম*

সারসংক্ষেপ: বঙ্গীয় রেনেসাঁসের আদি পুরুষ এবং ভারতীয় আধুনিকতার জনক হিসেবে রাজা রামমোহন রায় গত প্রায় দেড়শ বছরের বেশি সময় ধরে ব্যাপকভাবে কীর্তিত হয়েছেন। লিবারেল নানা চর্চার জন্য তিনি যেমন প্রশংসিত হয়েছেন, তেমনি উপনিবেশিত মনন ও তৎপরতার জন্য তাঁর সমালোচনাও কম হয়নি। সব মিলিয়ে রামমোহনচর্চার এক দীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য ধারাক্রম আছে। এ ধারাক্রমে বাঙালি মুসলমানের অংশগ্রহণ ও অবদান খুবই সীমিত। রেনেসাঁস, আধুনিকতা ও লিবারেল নানা চর্চার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান-সমাজেও রামমোহন নিত্য উচ্চারিত নাম; কিন্তু চর্চার পরিমাণ ও গুণগত দিক থেকে তা খুব ফলপ্রসূ হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধে বিশেষত বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানের রামমোহনচর্চার পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট রচনাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে, রামমোহন চর্চিত হয়েছেন মূলত জাতীয়তাবাদ, বঙ্গীয় রেনেসাঁস, আধুনিকতা, প্রগতি প্রভৃতি বর্গকে অবলম্বন করে; এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পুনরাবৃত্তিমূলক। এসব রচনার বিশিষ্টতা চিহ্নিত করার পাশাপাশি সীমাবদ্ধতার কারণও নির্দেশ করা হয়েছে।

১

উনিশ শতকের কলকাতার ইতিহাস-কাঠামোর ভিতর দিয়ে 'নিজে'র ইতিহাস অনুধ্যানের ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান কিছু সমস্যার মুখোমুখি হয়। একদিকে, ভদ্রলোক বাঙালির বিকাশরেখা বরাবর যে বিপুল জনগোষ্ঠী নানামাত্রিক অপরায়ণের কোঠায় পড়েছিল (Ghosh, 2006), বাঙালি মুসলমান প্রায় সর্বাংশে তার মধ্যে পড়ে। অন্যদিকে, পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের মুসলমান-সমাজ স্থানগত ও ভাবগতভাবে দূরবর্তী অবস্থানে থেকে কলকাতার যাবতীয় তৎপরতায় অংশগ্রহণ করেছিল। ফলে নানামাত্রিক অপরিচয়ের সংকটও তৈরি হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সংকট তৈরি হয়েছিল আসলে জনগোষ্ঠীর পরবর্তী ইতিহাসের সূত্র ধরে। বাঙালি মুসলমানের বিলম্বিত 'আধুনিকায়ন', মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর বিকাশের প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা ইতিহাস, রাজনৈতিক বিভাজন এবং দেশভাগজনিত পৃথক রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের কারণে কলকাতার উনিশ শতককে গভীরভাবে অনুধাবন করা বাঙালি মুসলমানের পক্ষে জটিলতর হয়েছে।

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

https://doi.org/10.62328/sp.v57i3.1

অবশ্য এ বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকও আছে। বিশ শতকের ষাটের দশকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছিল পূর্ব বাংলায় বিকশিত বাঙালি জাতীয়তাবাদ। পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের মানুষের 'মুসলমান' পরিচয়ের যে সর্বব্যাপী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অনেকটা তার বিপরীতে আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে 'বাঙালি' পরিচয় এসময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্বভাবতই কলকাতায় বিকশিত 'বাঙালির ইতিহাস' এবং বিশেষত উনিশ শতকের নতুন বাঙালির ইতিবৃত্ত 'বাঙালি' পরিচয়ের ক্ষেত্রে এসময় ব্যাপক ও গভীরভাবে ব্যবহৃত হয়। এ সূত্রেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বাঙালি জনগোষ্ঠীর আধুনিকায়নের ইতিহাস। নিজেদের আধুনিকতার কুলজি অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে বাঙালি মুসলমান ব্যাপকভাবে কলকাতার আধুনিকায়নের পর্বগুলোর সাথে একাত্ম বোধ করতে থাকে। আধুনিক বাঙালির ইতিহাস এবং বাঙালির আধুনিকায়নের ইতিহাস — দুই ক্ষেত্রেই রামমোহন রায় এ ইতিহাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হিসেবে স্বীকৃত। শুধু তাই নয়; বস্তুত, দুই ইতিহাসেই রামমোহনের অবস্থান যাত্রাবিন্দু এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে বাঙালি মুসলমান মুখ্যত বাঙালির ইতিহাসের এ দুই মহাবয়ানের সাথে সংশ্লিষ্টতাসূত্রেই রামমোহনের সাথে যুক্ত হয়।

কিন্তু সে যুক্ততার একটা সুস্পষ্ট পরোক্ষতা আছে। যেসব ডিসকোর্স প্রত্যক্ষত অন্তত বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনের বুদ্ধিবৃত্তিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা হিসেবে অদ্যাবধি হাজির আছে, রামমোহন রায়ের সাথে তার যোগ খুব প্রবল নয়। সাহিত্যিক উদাহরণ হিসেবে রামমোহন আমাদের ইতিহাসে খুব প্রবলভাবে উপস্থিত ব্যক্তিত্ব নন; সমাজ-সংস্কার ও ধর্ম-সংস্কারের যে প্রত্যক্ষ ময়দানে রামমোহনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, বাঙালি মুসলমানের সাথে তার যোগও প্রবল নয়। এমতাবস্থায় সাহিত্যিক কারণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সাহিত্যিক-রাজনৈতিক কারণে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি মুসলমানের প্রাত্যহিকতায় যেভাবে চর্চিত ও স্মৃত হন, রামমোহনের ক্ষেত্রে সেরকম ঘটে না। রামমোহনচর্চার ক্ষেত্রে এ বাস্তবতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। আমরা দেখব, বাঙালি মুসলমান বিশেষত বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানের স্মৃতি-শ্রুতিতে রামমোহন তুলনামূলক কম উপস্থিত; আর চর্চায় উপস্থিতির মাত্রা তার চেয়ে কম। বলা যায়, বাঙালি মুসলমানের রামমোহন-চর্চা রামমোহনের সামগ্রিক চর্চার সাপেক্ষে খুবই অনুল্লেখ্য।

২

রামমোহন রায়কে নিয়ে বাঙালি মুসলমানের লেখা গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। যেগুলোর নাম নেয়া যায়, তার মধ্যেও প্রচলিত কথাবার্তার অগোছালো প্রকাশই

বেশি। বেশিরভাগ প্রকাশনা সম্পর্কে কেবল এটুকু বলা যায় যে, ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে রামমোহন রায়ের একটা বাজার আছে; এবং সে প্রয়োজন মেটানোর জন্য কেউ কেউ বিভিন্ন উৎস থেকে বিবরণী ধার করে গ্রন্থপ্রকাশ করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রবন্ধও খুব একটা রচিত হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রামমোহন উল্লেখিত হয়েছেন ঐতিহাসিক বয়ানের অংশ হিসেবে। তাতে কখনো কখনো আলোচকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং রামমোহন-বিবেচনার বিশেষ মেজাজ ধরা পড়েছে। আমরা এখানে এরকম কতগুলো বই, প্রবন্ধ এবং বিবরণীর অংশবিশেষের পরিচয় দেব।

২.১

রামমোহন রায়ের ধর্ম-দর্শন নিয়ে রহমান হাবিব লিখেছেন *রাজা রামমোহন রায়: দর্শন ও ধর্মচিন্তা* (২০১০)। এ গ্রন্থে তিনি রামমোহন রায়কে মূলত একেশ্বরবাদী অধ্যাত্মতত্ত্বের একজন তুখোড় ভাষ্যকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অন্যসব কৃতিত্ব, যেমন সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা বিশেষত ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন-প্রয়াস, নারী ও কৃষকসহ সমাজের নিপীড়িত অংশের প্রতি মনোযোগ, উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্যোগ-আয়োজন ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকলেও ধর্মদর্শনই রহমান হাবিবের বিচারে রামমোহনের প্রধান কীর্তি হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

বইটিতে রামমোহন রায়ের প্রায় সব বাংলা পুস্তক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক বয়ান ও মন্তব্য আছে। কিছু মূল্যায়নও আছে। এর ফলে পুনরাবৃত্তিজনিত সংকট তৈরি হয়েছে। তা সত্ত্বেও বইটির বিশেষ মূল্য এই যে, একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে টেক্সটগুলো পঠিত হওয়ায়, বলা যায়, পাঠের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গিটি হলো, রচনাবলির নিরিখে রামমোহনকে একেশ্বরবাদী একজন ধর্মতাত্ত্বিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। শুধু টেক্সটে নয়, লেখক রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবনচর্যা এবং আচরণেও একেশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অব্যাহত প্রতাপ আবিষ্কার করেছেন তিনি।

আলোচনাটা তিনি করেছেন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে। মুখবন্ধে তিনি যে-দাবি করেছেন, এ বইয়ের আরেকটি নাম হতে পারত 'বেদান্ত ও ইসলাম: তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টিতে', তা ঠিকই আছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে রামমোহনকৃত অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সাথে তিনি প্রায় প্রতিটি পরতে ইসলামি তত্ত্বদর্শনের নানাদিককে মিলিয়েছেন, এবং প্রায় আক্ষরিক মিল আবিষ্কার করেছেন। এক্ষেত্রে কোরআন এবং হাদিস ছাড়াও ইসলামি সুফি-সাহিত্যের অনেকগুলো উদাহরণ ব্যবহার করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, ইসলামি একেশ্বরবাদী তত্ত্বদর্শনের সাথে রামমোহন রায়কৃত বেদান্তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রায় হুবহু সাযুজ্যপূর্ণ। তবে রামমোহনের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণটা ইসলাম ধর্মের দিকে না গিয়ে শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্মের দিকে কেন ধাবিত হয়েছিল, তার কোনো ব্যাখ্যা এ বই থেকে মেলে না।

বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রামমোহন পাঠের এ উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও এ পাঠে আরেকটি বড় সীমাবদ্ধতা চোখে পড়ে। তিনি দেখিয়েছেন, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় এবং ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য — রামমোহন রায় তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে এ সত্যই সারাজীবন লালন ও প্রচার করেছেন। কিন্তু সমসাময়িক হিন্দুধর্ম ও কলকাতার কোন বাস্তবতায় কিভাবে তিনি এ ধরনের চর্চায় ও সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন, তার কোনো আন্দাজ এ বই থেকে পাওয়া যায় না। রামমোহন এখানে উপস্থিত হয়েছেন এক সত্যসন্ধানী ব্যক্তি হিসেবে, আর সত্যের গরজেই তিনি ক্রমশ একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর প্ররোচনায় ভারতীয় ধর্মের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন — এ ধরনের একটা দৃষ্টিভঙ্গিই এ কেতাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

কামরুল ইসলাম প্রকাশ করেছেন দুটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। ২০১৭ সালে বেরিয়েছে *আধুনিক বাঙালি রামমোহন রায়* (দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৯)। ২০১৯ সালে তিনি *রামমোহন রায়: সমাজ ও সাহিত্য* নামে আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তবে দুই বইয়ের আলোচ্য বিষয়ে খুব একটা ফারাক নেই। ফলে ভিন্ন নামে দ্বিতীয় একটি বই প্রকাশের কারণটি পরিষ্কার নয়। *আধুনিক বাঙালি রামমোহন রায়* গ্রন্থে রামমোহনের সমাজকর্ম, গদ্য, প্রবন্ধ-সাহিত্য, ব্রহ্মসঙ্গীত, গৌড়ীয় ব্যাকরণ ইত্যাদি নিয়ে সংক্ষিপ্ত অধ্যায় আছে। অন্তত চারটি অধ্যায় আছে 'বাঙালি' পরিচয়ভিত্তিক। অধ্যায়গুলোর শিরোনাম যথাক্রমে 'বাঙালির পরিচয়: ইতিহাস ঐতিহ্যে', 'রামমোহন রায় আধুনিক বাঙালি', 'রামমোহন রায়: বাঙালির বাঙালি সত্তা' ও 'রামমোহন রায়: বাঙালিদের পথিকৃৎ'। অধ্যায়গুলো খুবই সংক্ষিপ্ত এবং নতুন কোনো উপকরণ যেমন এগুলোতে ব্যবহৃত হয়নি, তেমনি কোনো বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় নেই। খুব প্রাথমিক ধরনের এ বই রচনার কোনো ভিত্তি যদি টেক্সটের বাইরে দাঁড়িয়ে মূল্যায়ন করতে চাই, তাহলে দুটি মনোভঙ্গি বিশেষভাবে শনাক্ত করা যাবে। প্রথমত, রামমোহন রায়কে এখানে দেখা হয়েছে মুখ্যত সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক হিসেবে। দ্বিতীয়ত, রামমোহনের বাঙালি পরিচয়কে খুব গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। লেখকের *রামমোহন রায়: সমাজ ও সাহিত্য* নামের অন্য বইটিতে দুই-একবার 'ভারতপথিক' কথাটা ব্যবহৃত হলেও এবং রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক মতের ইশারা থাকলেও মোটের উপর আলোচ্য বিষয়ের ও দৃষ্টিভঙ্গির খুব একটা হেরফের হয়নি।

কামরুল ইসলামের রচনা রামমোহনচর্চার এক ধরনের সচলতার উদাহরণ পেশ করে; কিন্তু ওই চর্চায় কোনো প্রকার তাৎপর্য বা ব্যক্তিত্ব যোগ করে না।

কিন্তু কামরুল ইসলাম যে রামমোহনের বাঙালি পরিচয়কে এতটা মুখ্য করে উপস্থাপন করেছেন, লেখকের নিজের দিক থেকে তার বিচিত্র তাৎপর্য আছে। প্রথমত, তিনি বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটা লম্বা সিলসিলার মধ্যে একটা উৎকর্ষমণ্ডিত অংশের সূত্রধার হিসেবে রামমোহনকে দেখেছেন, এবং এ পর্বটির নামায়ন

করেছেন 'আধুনিক বাঙালি' হিসেবে। উল্লেখ্য, 'আধুনিক' অভিধাটি তিনি ব্যবহার করেছেন একেবারেই প্রচলিত তাৎপর্যে; অথবা বলা যায়, এ অভিধার যে বিচিত্র জটিলতা আছে, সে সম্পর্কে তিনি মোটেই সচেতনতার পরিচয় দেননি। কিন্তু আধুনিকতা বা আধুনিক হয়ে ওঠা তাঁর কাছে অনিবার্যভাবে ইতিবাচক; আর রামমোহনকে তিনি সে চর্চায় সফল উদ্যোক্তা হিসেবে দেখেছেন। দ্বিতীয়ত, রামমোহনের 'আধুনিক' হয়ে ওঠা বা 'আধুনিক' কর্মকাণ্ডের সাফল্য তাঁর কাছে জনগোষ্ঠী হিসেবে বাঙালির অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তার পরিচায়ক; অন্তর্নিহিত ওই শক্তির গুণে রামমোহন সমগ্র ভারতের পথপ্রদর্শক হতে পেরেছেন, যা আসলে বাঙালির শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন করে। তিনি (২০১৯: ৫৯) লিখেছেন, '... রামমোহন রায় বাঙালি সত্তার যথার্থ রূপ তুলে ধরেছেন এবং বীরোচিতভাবে তা প্রচার করে আধুনিক জীবনদর্শন সৃষ্টি করে গেছেন।' এ বাক্যে দাবি করা হয়েছে, রামমোহন রায়ের জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত সামগ্রিক সত্তাই আসলে বাঙালি সত্তা এবং ওই সত্তার সামগ্রিক মুক্তি তাঁর মধ্যে ঘটেছে বলেই তিনি সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন। তৃতীয়ত, রামমোহন রায় অসাম্প্রদায়িকতা ও প্রগতিশীলতার চর্চার মধ্য দিয়ে 'সকল মানুষের ঐক্যে'র যে পথ দেখিয়ে গেছেন, তার সূত্র ধরেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামসহ বাঙালি জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোকিত প্রতিভাগণ আবির্ভূত হয়েছেন। আর 'বাঙালির এই চিরায়ত শক্তির স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।' ফলে কামরুল হাসানের ভাষ্যে বাংলাদেশে বাঙালি জাতির যে স্বাধীন অভিব্যক্তি, তার নতুনতর সাফল্যের জন্যও রামমোহন রায় দিশারি হিসেবে কাজ করবেন। বাস্তবে ঘটনাগুলো কিভাবে ঘটেছে, তার কোনো ইশারা বইটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে পরিষ্কার হয়নি; কিন্তু দাবিগুলো বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

এনামুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে 'রামমোহন রায়ের ধর্মচিন্তা: প্রেক্ষাপট সমাজ সংস্কার' শিরোনামে পিএইচডি অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন। শিরোনামে সমাজ-সংস্কারের প্রেক্ষাপটে ধর্মচিন্তা নিয়ে পর্যালোচনার আভাস থাকলেও তিনি আসলে রামমোহন রায়ের উপর একটি সামগ্রিক আলোচনাই করেছেন। তবে তাঁর সন্দর্ভে রামমোহনের কাজের কোনো অনালোকিত অংশ নতুন করে উন্মোচিত হয়নি, কিংবা বিদ্যমান মূল্যায়নগুলোর উপর কোনো নতুন পর্যালোচনাও রচিত হয়নি। বরং সার্বিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিযুক্ত করে তিনি ব্যক্তির পরম্পরাহীন কৃতিত্ব হিসেবে রামমোহনের রচনা ও তৎপরতার আলোচনা করেছেন। এক জায়গায় লিখেছেন: 'তিনি আপন সময়ের অতীত বস্তু! কেবল সময়েরই কেনো? আপন দেশেরও অতীত। ভারতবর্ষ তাঁর যোগ্য নিবাস নয়।' (এনামুল, সালবিহীন: ৩৮) অন্যত্র যুগের কিছু বিশিষ্টতাকে তিনি এককভাবে রামমোহনের উপর আরোপ করে লিখেছেন (এনামুল, সালবিহীন: ২৩৯): 'মধ্যযুগীয় বাঙলাকে তিনি হঠাৎ আধুনিক যুগের দ্বারদেশে এনে উপস্থাপিত

করলেন এবং বহু বছরের সঞ্চিত জড়ত্বের যবনিকা অপসারণ করে মুক্তিসূর্যের আলোকে চতুর্দিক প্রদীপ্ত করে তুললেন এবং অচলায়তনের অবরুদ্ধ বাতায়ন উন্মুক্ত করে বহির্বিশ্বের অবাধ হাওয়া তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন।' বর্ণনার আলঙ্কারিকতা আর আতিশয্য ছাড়াও এখানে আবেগের অতিশায়ন আছে; আর সেই আবেগের প্রলেপে বাস্তবের রামমোহন হারিয়ে গিয়ে তৈরি হয়েছে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ এক অতি-মানুষ। সন্দর্ভে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি রামমোহনের ধর্মদর্শনচর্চাকে 'বহু ধর্মের সমন্বয়' এবং 'ইউনিভার্সেল রিলিজিয়নে'র অন্বেষণ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

২.২

রামমোহন রায়কে নিয়ে বাঙালি মুসলমানের তরফে অদ্যাবধি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আলোচনা আমরা পেয়েছি কাজী আবদুল ওদুদের রচনায়। এর মধ্যে আছে *শাশ্বত বঙ্গ* গ্রন্থভুক্ত 'রামমোহন রায়', 'রামমোহনের বিরুদ্ধ-পক্ষের বক্তব্য', 'নেতা রামমোহন' ইত্যাদি প্রবন্ধ। 'তুহ্‌ফাতুল মুওহ্‌হিদীন' নামের একটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন *তত্ত্বকৌমুদী* পত্রিকায় ১৩৬১ সালে। এছাড়া *বাংলার জাগরণ* গ্রন্থেও বেশ লম্বা পরিসরে রামমোহনের জীবন ও কীর্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবদুল ওদুদের আলোচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, ওইকাল পর্যন্ত রামমোহন-পাঠের প্রধান ধারাগুলোর পর্যালোচনা করেই তিনি নিজের অবস্থান ঘোষণা করেছেন। এ জন্য তাঁকে নতুন-উত্থিত অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে, আর প্রভাবশালী অনেক মত ও সিদ্ধান্ত খারিজ করতে হয়েছে। সাধক-চরিত্র হিসেবে রামমোহনে তাঁর যে আস্থা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাতে কোনো প্রকার ব্যত্যয় দেখা যায়নি।

'রামমোহন রায়' প্রবন্ধে তিনটি উপশিরোনাম যুক্ত হয়েছে যথাক্রমে 'রামমোহন ও মুসলিম-সাধনা', 'রামমোহন ও হিন্দু-সাধনা' এবং 'রামমোহন ও খৃষ্টধর্ম' নামে। আলোচনার এ ধরনটি *বাংলার জাগরণ* গ্রন্থেও অনুসৃত হয়েছে। ইসলামি শাস্ত্রচর্চাই রামমোহনের ধর্মচিন্তার মূল উৎস — অনেকের এ মত কাজী আবদুল ওদুদ মেনে নিয়েছেন, এবং এর সমর্থনে কোরান ছাড়াও সুফি-ঘরানার বেশ কয়েকজন সাধকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সুফি-সাহিত্য রামমোহনের আনন্দের উৎস হলেও, কাজী আবদুল ওদুদের (১৯৮৩: ২০৮-০৯) মতে, মোতাজেলাদের কাছ থেকেই তিনি যুক্তিতর্কের প্রধান কয়েকটি সম্বল পেয়েছিলেন। তিনি আরো খেয়াল করেছেন, রামমোহনের কালে মুসলমান-সমাজে ইসলামি ধর্মতত্ত্ব নিয়ে এ ধরনের কার্যকর পর্যালোচনার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। হিন্দুশাস্ত্র নিয়ে রামমোহনের চর্চা সম্পর্কেও আবদুল ওদুদ প্রায় সমধর্মী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। বলেছেন (১৯৮৩: ২১১), হিন্দুশাস্ত্রের সুবিপুল বিস্তারকে সামগ্রিক বিচারের

আওতায় এনে রামমোহন যেভাবে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ ও লোকশ্রেয়ঃ-তত্ত্ব' উদঘাটন করেছেন, ভারতের হিন্দুসমাজ তার যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করতে পারেননি। এবং সেটা 'সেই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত কোনো ত্রুটির জন্য নয় — তাঁর দেশবাসীর সত্য-প্রীতির ও বৃহত্তর দেশের কল্যাণ-কামনার অভাবের জন্যই' (১৯৮৩: ২১৫)।

আবদুল ওদুদ (১৯৯০: ৪; ১৯৯০ক: ১৭৮-৮২) বারবার জোর দিয়ে বলেছেন, *তুহফাত* পরিণত মননের রচনা, অন্য অনেকে যেমন একে 'অপরিণত' বলেছেন সেরকম নয়। তাঁর রামমোহন-বিচারে এ সিদ্ধান্তের গুরুতর ভূমিকা আছে। তিনি রামমোহনকে বিশ্বজনীন ও যুক্তিনির্ভর হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। ''তুহফাতে'র যুগে রাজা যুক্তিবাদ-নির্ভর ছিলেন, আর পরে তাঁর অবলম্বন হয় 'শাস্ত্রাশ্রয়ী যুক্তিবাদ" — প্রচলিত এ মত বাতিল করে তিনি দাবি করেছেন (১৯৯০:১৫), যুক্তিবাদই পূর্বাপর রামমোহনের মূল ভিত্তি। এর প্রমাণ আছে অ্যামহার্স্টকে লেখা বিখ্যাত পত্রে, আর ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টের ডিডে। তদুপরি, শাস্ত্রালোচনার আগে তুহফাতের যুগে তাঁর ভক্তিযোগ ছিল না — এ মতও তিনি খারিজ করেন এই বলে যে, 'তুহফাত' মনোযোগ দিয়ে পড়লে একজন ভক্তিমানের সাক্ষাৎই পাওয়া যাবে। তবে এ ভক্তি অবতার-পয়গম্বরদের জন্য নয়, বিশ্ববিধাতার জন্য।

কাজী আবদুল ওদুদের রামমোহন-বিচারের অন্যতম লক্ষণীয় দিক হল, ব্যক্তি রামমোহনের চরিত্র-মাহাত্ম্য তাঁর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রামমোহন অসাধু-উপায়ে ধন-উপার্জন করেছেন — এ দাবি তিনি প্রকারান্তরে বাতিল করে দিয়েছেন (১৯৯০: ৫)। অন্যত্র (১৯৯০: ২৫) মুসলমান প্রণয়িনী ও তার গর্ভজাত সন্তানের প্রসঙ্গটিও তিনি বাতিল করেছেন। 'রামমোহনের বিরুদ্ধ-পক্ষের বক্তব্য' প্রবন্ধে (১৯৮৩: ২৫০-৫৪) এ ধরনের আচরণগত ও ভাবগত অভিযোগগুলো তিনি যুক্তিনিষ্ঠ কায়দায় খারিজ করেছেন। রামমোহনের প্রতি তাঁর এ আনুকূল্যের কারণ বোধহয় এই যে, ধর্ম তথা ভাবজগৎ সম্পর্কে নিজের আরাধ্য কাঠামোটি তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন রামমোহনের মধ্যে। ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে ওদুদ (১৯৯০: ১০) লিখেছেন — 'মনে হয় ভট্টাচার্য্যের চোখে ধর্ম মুখ্যত একটি বিধিবদ্ধ পদ্ধতির অনুসরণ, ... অপরপক্ষে রামমোহন তাকাচ্ছেন, ধর্মকর্ম একটি সদ্‌যুক্তিপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে কি না সেদিকে, বিশেষ করে তাতে অনুষ্ঠাতার নৈতিক সমুন্নতির সম্ভাবনা আছে কি না।' এ দৃষ্টিভঙ্গি কার্যত ধর্ম সম্পর্কে ওদুদের নিজের মনোভাব ও তৎপরতার গোড়ার কথা। মুসলমান-সমাজে যে সংস্কার-প্রয়াসের জন্য তিনি খ্যাতিমান, তার ভিত্তিও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর এ বোধ।

এ. এফ. সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ ১৯৬৫ সালে প্রকাশ করেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *সোস্যাল আইডিয়াজ এন্ড সোস্যাল চেঞ্জ ইন বেঙ্গল (১৮১৮-১৮৩৫)*। গ্রন্থটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে কলকাতাকেন্দ্রিক, এবং স্বভাবতই রামমোহন রায় এ বইয়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ প্রাথমিক উৎসের ভিত্তিতে রামমোহনের

কৈশোর-যৌবনের বিবরণ দিয়েছেন। তাতে হিন্দু ও ইসলামি ধর্মতত্ত্বসহ আরবি-ফারসি চর্চা এবং উদারনীতি ও যুক্তিবাদী চর্চার দিকটিকেই তিনি সামনে এনেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সেকালে কলকাতা ছিল হিন্দু, মুসলিম ও ইংরেজ — এ তিনটি সাংস্কৃতিক ধারার মিলনক্ষেত্র। রামমোহন এ পরিবেশ থেকে যথাসম্ভব গ্রহণ করে নিজের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চিন্তাচেতনার বিকাশ ঘটাতে পেরেছিলেন।

সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ দেখিয়েছেন, বিভিন্ন ধর্ম এবং বিশেষত ইউরোপীয় চিন্তাচেতনায় স্নাত হলেও রামমোহন রায় কখনো হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেননি, বরং তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড় সমর্থক। বৃহত্তর সমাজ ও বিপুল জনমানুষ নিয়ে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা থাকায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁকে কাজ করতে হবে হিন্দু-সমাজের ভেতর থেকেই। আর সে কারণেই ব্রাহ্মসমাজকে তিনি আলাদা ধর্মের আকার না দিয়ে হিন্দুধর্মের একটা উপ-সম্প্রদায় হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

রামমোহনের রচনা ও তৎপরতা এবং সংশ্লিষ্ট বহুজনের সাক্ষ্য থেকে তিনি তাঁকে একজন প্রকৃত উদারনীতিবাদী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, আর ওই নিরিখেই মূল্যায়ন করেছেন রামমোহনের সমাজ-সংস্কারমূলক ও শিক্ষামূলক বিচিত্র কর্মকাণ্ডকে। স্বভাবতই তাঁর মূল্যায়নে ১৮২৩ সালে লর্ড অ্যামহার্স্টকে লেখা বিখ্যাত পত্রটি খুব গুরুত্ব পেয়েছে। রামমোহনের আমূল ইঙ্গবাদী অবস্থানকে সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ দেখেছেন সেকালের জন্য অতি-ইতিবাচক গুণ হিসেবে। অবশ্য অন্যত্র তিনি রামমোহন রায়ের কিছু সীমাবদ্ধতারও উল্লেখ করেছেন। বলেছেন (Ahmed 1976: 57), তত্ত্বীয়ভাবে জাত-পাত ও প্রথার বিরোধিতা করলেও তিনি প্রকাশ্যে ওগুলো মান্য করতেন; বলা যায়, মার্টিন লুথারের মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা তিনি দেখাতে পারেননি। রামমোহনদের কাজের শ্রেণি ও ধর্মগত সীমাবদ্ধতার উল্লেখও তিনি করেছেন। তাহলেও সেকালের ভাব ও কর্মজগৎকে তিনি প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে যেভাবে দেখেছেন, তাতে রামমোহনের প্রগতিশীল ভূমিকায় তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির *বাংলাপিডিয়ার* 'রাজা রামমোহন রায়' ভুক্তিটি লিখেছেন এ. এফ. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ। এখানে তিনি রামমোহনকে শুরুতেই 'হিন্দুধর্মের মহান সংস্কারক' বলে পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয় পর্বে বলেছেন, রামমোহন 'হিন্দু সংস্কারের এক মহান যুগের সূত্রপাত করেন।' তৃতীয় যে ব্যাপারটাকে এ ভুক্তিতে অধ্যাপক সালাহ্উদ্দীন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো, 'উপমহাদেশে জাতীয় চেতনার বিকাশে' রামমোহনের 'প্রভূত অবদান'।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে প্রধানত গদ্যলেখক রামমোহন রায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করেছেন। তাঁদের

মতে (১৯৯৭: ৫৭), রামমোহনের গদ্যে বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক প্রবহমানতা সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত না হলেও 'তাঁর সমগ্র বিদ্রোহী জীবনের একটি গভীর বাণী সকল যুক্তিতর্ক এবং শাস্ত্র-বিচারের পশ্চাতে গ্রন্থগুলোর পটভূমিকা হিসাবে তাঁর রচনাকে একটি অভাবনীয় মহিমা দান করেছে।' এভাবে রামমোহনের হাতেই বাংলা গদ্য বলিষ্ঠ চিন্তা ও যুক্তিতর্কের ধারণক্ষম বাহন হয়ে উঠেছে। এ সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে: 'হিন্দু, ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের সার সংকলন করে রামমোহন ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।' তাঁরা মনে করেন, রামমোহন যে চিন্তাতরঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন, তার কল্যাণময় ফল আজও সমাজদেহে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

ওয়াকিল আহমদের 'রামমোহন রায়: একটি ব্যক্তিত্ব' সাধারণ পরিচিতিমূলক প্রবন্ধ। তবে রামমোহন রায়ের আরবি-ফারসি ও ইসলামি ধর্মতত্ত্বচর্চা বিশেষ গুরুত্বের সাথে এখানে উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি ফারসিতে পত্রিকা প্রকাশ করেছেন; আরবি ভাষায় ইউক্লিড ও অ্যারিস্টটল পড়েছেন; দিল্লির বাদশাহ কর্তৃক 'রাজা' উপাধিপ্রাপ্ত হয়েছেন; এবং সর্বোপরি 'পোশাক-পরিচ্ছদ, খানাপিনা ও আচার-আচরণে' এতটাই মুসলমানি কায়দা অনুসরণ করতেন যে, "রক্ষণশীল হিন্দু নেতারা তাঁকে 'জবরদস্ত মৌলভী' বলে অভিহিত করতেন।" (ওয়াকিল ২০০৪: ১০৩) রামমোহনের সামগ্রিক চর্চার বিচারে তাঁর অন্য মন্তব্যটি অবশ্য আরো গুরুত্বপূর্ণ (২০০৪: ১০৩): 'পাটনায় অধ্যয়নকালে আরবিতে মূল কোরান পড়ে তিনি একেশ্বরবাদী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন।'

ওয়াকিল আহমদ তাঁর অপর প্রবন্ধ 'বাংলার রেনেসাঁ'য় রামমোহন রায়কে তুলনামূলক পর্যালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছেন। 'পৌত্তলিকতার স্থলে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন এবং সতীদাহ প্রথা নিবর্তন', তাঁর মতে (২০০৪: ১৬), রামমোহনের প্রধান দুই কীর্তি। এর বাইরে 'বাংলা গদ্যকে আন্দোলনের ভাষা রূপে গ্রহণ'ও আরেকটি 'বিপ্লবাত্মক কাজ'। কিন্তু তিনি একই সঙ্গে রামমোহন রায়ের চিন্তা, আচরণ ও অবস্থানের একরাশ বৈপরীত্যও শনাক্ত করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন (২০০৪: ১৭): 'এগুলো রামমোহনের ভেতরকার পিছুটান ও দুর্বলতা — একদিকে আলো, অপরদিকে অন্ধকার। অর্থাৎ রেনেসাঁর পূর্ণ আলোয় আলোকিত নন তিনি।'

উনিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ গবেষক গোলাম মুরশিদ রামমোহন রায়কে নিয়ে আলাদা কোনো বই বা প্রবন্ধ রচনা করেননি। কিন্তু তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থে রামমোহন খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। যেমন *হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাস* (২০১৮ [প্রপ্র ২০০৬])। 'রেনেসাঁ' এবং 'বাঙালি' পরিচয়বাদী ইতিহাসের প্রভাবশালী-প্রচলিত অনুমানগুলো ব্যবহার করেই তিনি এ বইয়ে উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন। স্বভাবতই রামমোহন রায় বিবরণীতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছেন। *কালাপানির হাতছানি: বিলেতে বাঙালির ইতিহাস* বইয়ে বিলাতযাত্রার

ক্ষেত্রে তিনি (২০১৩: ৩৪) রামমোহনকে বর্ণনা করেছেন 'দুঃসাহসী' মানুষ হিসেবে। রামমোহনের নানা আচার-পালন, খাবারে রক্ষণশীলতা, পৈতা-পরাসহ নানা বৈপরীত্যের উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন তাঁর মুসলমান পাচকের কথা। তবে, রামমোহনের এ ধরনের আপাত-রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও, গোলাম মুরশিদের (২০১৩: ৩৬) মতে, তিনি প্রচণ্ড পৌত্তলিকতা-বিরোধী এবং অসাধারণ রকমের আধুনিক ছিলেন। *রেনেসন্স: বাংলার রেনেসন্স* বইতে গোলাম মুরশিদ (২০১৫: ১০৭) রামমোহনকে ইতালীয় রেনেসাঁর পণ্ডিতদের সাথে তুলনা করে বলেছেন, তিনি রেনেসন্সের পণ্ডিতদের মতো বহুভাষাবিদ ছিলেন। একেশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠাই, তাঁর মতে, রামমোহনের উপনিষদ-চর্চার মূল উদ্দেশ্য।

২.৩

এবার আমরা তিনজনের মন্তব্য বা বিশ্লেষণের উল্লেখ করব, যেখানে রামমোহনের রায়ের চিন্তা ও তৎপরতা বিষয়ে সমালোচনাধর্মী এবং এমনকি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে।

অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গলাভ এবং আলাপচারিতার স্মৃতি সম্বল করে আহমদ ছফা রচনা করেছেন প্রভাবশালী গ্রন্থ *যদ্যপি আমার গুরু* (২০০০)। এখানে দেখা যায়, অধ্যাপক রাজ্জাক আসলে উনিশ শতকে কলকাতায় সংঘটিত রেনেসাঁর ধারণাই বাতিল করে দিয়েছেন। স্থান ও কালের বিশাল পটভূমিতে উনিশ শতকের ঘটনাবলিকে স্থাপন করে তিনি দেখতে পেয়েছেন, সেখানে আলোর তুলনায় অন্ধকার মোটেই কম তৈরি হয়নি। বড় মানুষদের রেফারেন্স নিঃসন্দেহে উনিশ শতকীয় আলোর প্রধান ভিত্তি। অধ্যাপক রাজ্জাক এ তালিকার এক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কাউকে বড় মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেন নাই। ওই বড় মানুষদের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছেন অনতিক্রম্য সংকীর্ণতা; আর তাঁদের কাজকর্মকেও তিনি সংকীর্ণ পটভূমিকায় নিষ্পন্ন তৎপরতা হিসেবেই দেখেছেন। ক্ষুদ্র সমাজের গণ্ডি এড়িয়ে বৃহৎ হিন্দুসমাজেও তার কোনো প্রভাব পড়েনি; মুসলমান সমাজ তো দূরের কথা। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, একমাত্র বাংলা ভাষার চর্চাকেই রাজ্জাক উনিশ শতকের কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে মন্তব্য ও মূল্যায়ন করেছেন।

রামমোহন রায়ের ব্যক্তিত্ব বোঝার জন্য অধ্যাপক রাজ্জাক উর্দু কবি মীর সওদার উদাহরণ টেনেছেন। ছোট ছোট গল্পগাছা ব্যক্তিকে বোঝার ক্ষেত্রে রাজ্জাক সাহেবের এক প্রধান অবলম্বন। এক্ষেত্রেও তিনি একই পথ ধরেছেন। রামমোহন রায়কে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন বাহাদুর শাহ। বিলাত পাঠানোর কালে তিনি সে উপাধি দেন। তখন তাঁর নিজেরই রাজত্ব নাই। কিন্তু রামমোহন রায় সে উপাধি

আমৃত্যু ব্যবহার করে নামের সাথেই স্থায়ী করে গেছেন। অন্যদিকে, রামমোহন রায়ের সমসাময়িক উর্দু-কবি মীর সওদা একবার বসেছিলেন অযোধ্যার বাজারে। তখন নবাব এসেছেন বাজার দেখতে। লোকজন তাজিম দেখাতে দেখাতে অস্থির। সওদা এক দোকানে বসে হুকা খাচ্ছিলেন। তাকে খবর দেয়া হলো, নবাব এসেছেন, তার সাথে দেখা করে আসা উচিত। জবাবে মীর সওদা নাকি বলেছিলেন, 'মাইভি উর্দু জবান কা নওয়াব হ্যায়। মগর কৌন পুঁছে?'

রামমোহন রায়ের ব্যক্তিত্ব তালাশ করার এ কেতা হয়ত অনুমোদনযোগ্য নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তি রামমোহন সম্পর্কে রাজ্জাকের বিশেষ কোনো বিদ্বেষ নেই। পরিষ্কার বলেছেন, তাঁর 'যোগ্যতা আছিল অঢেল'। লিখতে পারতেন আরবি, উর্দু, ফারসি, সংস্কৃত, ইংরেজি ইত্যাদি অনেক ভাষা। কিন্তু 'ডাইনে বামে না তাকাইয়া হি চুজ টু রাইট ইন বেঙ্গলি'। বাংলায় লেখা এবং বাংলা ব্যাকরণ লেখাই, রাজ্জাকের মতে, রামমোহন রায়ের সবচেয়ে বড় কাজ। তাহলে 'ভারতবর্ষের আধুনিকতার জনক' হিসেবে রামমোহন রায়ের ধর্মসংস্কার প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাজ্জাকের মূল্যায়ন কী? না। তিনি একে বড় কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। কেন? ভারতবর্ষে রামমোহনের মতো ধর্মপ্রচারক আগে অনেকেই ছিলেন। রামমোহন সে ধারার শেষ মানুষ। কাজেই এটাকে এত বড় করে দেখা, তাঁর মতে, ইতিহাসসম্মত নয়।

বদরুদ্দীন উমর ইউরোপীয় রেনেসাঁর কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোকে বাংলার নবজাগরণের দাবিকে কার্যত বাতিল করে দিয়েছেন। স্বভাবতই ওই জাগরণের প্রধান পুরুষ বলে কথিত রামমোহন রায়ও মোটেই তাঁর আনুকূল্য পায়নি। তাঁর মতে, রামমোহনসহ উনিশ শতকের প্রধান ব্যক্তিবর্গ আর্থিকভাবে একদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-উদ্ভূত ভূমি-স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, অন্যদিকে কাজ করেছেন ব্রিটিশ শাসক-শ্রেণির মুৎসুদ্দি হিসেবে। কাজেই 'বাণিজ্যিক বুর্জোয়া' অভিধাটিও কোনো অর্থেই তাঁদের জন্য প্রযোজ্য নয় (বদরুদ্দীন ২০১৬: ২২)। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীনতার কোনো আকাঙ্ক্ষা রামমোহনদের মধ্যে দেখা যায়নি। তাঁদের তৎপরতা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদনেই সীমিত ছিল। বদরুদ্দীন উমরের (২০১৬: ২৫-২৭) মতে, নীলচাষ বিষয়ে রামমোহন রায়ের অবস্থান, ইংরেজদের এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রস্তাব কিংবা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবি — এগুলোর সাথে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, দেশ বা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনো সম্পর্ক ছিল না, ছিল বড়জোর গোষ্ঠীস্বার্থ। আরেকটি বড় অভিযোগ তিনি উত্থাপন করেছেন রামমোহন এবং সমকালীন কৃতী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। তাঁর মতে (২০১৬: ২৭-২৯), এঁদের চিন্তাভাবনাকে 'মানবতাবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করার কোনো উপায় নাই। এঁরা কাজ করেছেন সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে। এমনকি স্বসম্প্রদায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্যও এঁদের বিশেষ ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সেদিক

থেকে, তাঁর মতে, খণ্ডিত মানবতাবাদের 'সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি ঘটেছিলো ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে'। এ তালিকায় তিনি রামমোহনকে রাখেননি। তার একটা কারণ হয়ত এই, তিনি মনে করেন (২০১৬: ২৪), সম্প্রদায়ভিত্তিক ওই তৎপরতাই 'পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে পরবর্তীকালে পরিণতি লাভ করেছিল সাম্প্রদায়িকতায়'।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক *উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণে* রামমোহন রায় খুব গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছেন। রামমোহন রায়ের শক্তি ও সীমাবদ্ধতা তিনি নির্দেশ করেছেন ঔপনিবেশিক বাস্তবতার বিশেষ গড়নের আবহে। ওইকালের জনবিচ্ছিন্ন ভদ্রলোকসমাজের অসামান্য প্রতিনিধি হিসেবেই সেখানে রামমোহনের অবস্থান। সতীদাহ-নিবারণী আন্দোলনের তুলনায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা এবং পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত বাংলা গদ্য রচনাকেই তিনি রামমোহনের বড় কৃতিত্ব হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। পৌত্তলিকতা-বিরোধী লড়াইয়ের মধ্যে দেখেছেন অনড়-অচল পুরাতনের সাথে বিচ্ছেদ, আর সতী-বিষয়ক লেখালেখিতে আবিষ্কার করেছেন যুক্তিবাদী উদারনীতির এক মহান পুরুষকে।

বাংলা গদ্যে খুব সাফল্যের সাথে এসব চর্চার একটা বড় অংশ সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে রামমোহন গদ্যের প্রায় সম্পূর্ণ স্তরান্তর ঘটাতে সমর্থ হন। এর মধ্য দিয়ে গদ্য যুক্তির বাহন হয়ে ওঠে; তত্ত্বচর্চা ও বিরোধ-মীমাংসার বাহন হওয়ার নতুন পর্বে উন্নীত হয়। কিন্তু সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লক্ষ করেছেন, সমকালীন বাস্তব পরিস্থিতির প্রচণ্ডতার মধ্যে শাসক ইংরেজ এবং সংস্কৃত ও ইংরেজির নানামাত্রিক টানাপড়েনের মধ্যেই রামমোহনের তৎপরতা ও গদ্যচর্চা পরিচালিত হয়েছে। রাজনীতির আলোচনা তিনি বাংলায় করতেন না, করতেন ইংরেজিতে (সিরাজুল ২০০২: ৯৩)। এর মধ্য দিয়ে সমকালীন রাজনীতির যে জনবিচ্ছিন্নতা, ভাষাচর্চায় তা প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে, সংস্কৃত-নির্ভর সাধুগদ্যই হয়েছে তাঁর বাহন। গদ্যকে জনবোধ্য করার কোনো উদ্যোগই রামমোহনের মধ্যে দেখা যায় না। ইউরোপীয় ধর্মসংস্কারক মার্টিন লুথারের সাথে তুলনা টেনে তিনি রামমোহনের জনবিচ্ছিন্নতার মাত্রা বুঝতে চেয়েছেন। মার্টিন লুথার ভাষাকে জনবোধ্য এবং জনগ্রাহ্য করার জন্য বিচিত্র উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ তাঁর জীবদ্দশাতেই জার্মান বাইবেলের ৩৭৭টি সংস্করণ হয়েছিল। কিন্তু বেদান্তের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো কিছু ঘটেনি, এবং রামমোহন সে লক্ষ্য নিয়েও অগ্রসর হননি। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর (২০০২: ৯৭) মতে, প্রটেস্টান্ট বিপ্লব আর ব্রাহ্মধর্মের মধ্যেই মৌলিক ব্যবধান ছিল: 'প্রটেস্টানটিজমের মূল কথাটা বিদ্রোহ, ব্রাহ্মধর্মের মূল কথাটা আপোস। প্রটেস্টান্টরা দুর্বিনীত, ব্রাহ্মরা ভদ্র।' এ অন্তর্লীন বাস্তবতার প্রভাব পড়েছিল রামমোহনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ও গদ্যে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঔপনিবেশিক শাসনের প্রচণ্ড বাস্তবতার মধ্যে রামমোহনের মতো 'অসামান্য' মানুষের কর্তাসত্তাও যে কতটা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল, এবং সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে ওই বাস্তবতা কত গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ছিল, তার নিরিখে রামমোহন রায়ের গদ্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তার মধ্যেও গদ্যচর্চায় রামমোহনের দুটি বড় কৃতিত্ব শনাক্ত করেছেন তিনি (২০০২: ৯৮): প্রথমত, বাংলাভাষার চর্চাকে রামমোহন সম্মানজনক করে তুললেন, যেমন বেকন একদা লাতিনের বদলে ইংরেজি-চর্চাকে সম্মানজনক করেছিলেন; দ্বিতীয়ত, বাংলা গদ্যে যুক্তিশীলতার আমদানি করে একে নিয়ে এলেন বিদ্যালয়ের বাইরে — জনসভায় না হলেও অন্তত আত্মীয়সভায়। অবশ্য উনিশ শতকীয় ওই পর্বের সার্বিক গদ্যচর্চা সম্পর্কে তাঁর শ্রেণি-সচেতন মননের দাবিটিও তিনি পরিহার করেননি (২০০২: ৯৮): 'একদা পয়ার বাধা দিয়েছিল গদ্যের আবির্ভাবকে, এই নতুন গদ্যও তেমনি গোপনে বাধা দিচ্ছিল গদ্যের আরো বেশি বিকাশকে।'

৩.১

বাঙালি মুসলমান বিশেষত বাংলাদেশি বাঙালি মুসলমানের স্মৃতি ও চর্চায় উপস্থিত যে-রামমোহনের রূপরেখা উপরে অঙ্কিত হল, তাকে খুব একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ বলা যাবে না। গুরুত্বপূর্ণ নতুন দিকের উদ্ভাসন এসব লেখালেখিতে খুব একটা ঘটেনি। বড় ব্যতিক্রম কাজী আবদুল ওদুদ। তাঁর অবস্থান ও বিশ্লেষণকে সম্ভবত সামগ্রিক রামমোহন-পাঠের মধ্যেই খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলা যাবে। এ. এফ. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ তাঁর গবেষণায় রামমোহন-সম্পর্কিত কিছু নতুন উপকরণ ব্যবহার করেছেন। তবে নতুন কোনো বিশ্লেষণ বা সিদ্ধান্তে উপনীত হননি। আহমদ ছফার প্রযোজনায় উপস্থাপিত অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের ভাবনায় নতুনত্ব আছে; তবে তা পদ্ধতিমাফিক উৎপাদিত নয়। বদরুদ্দীন উমর এবং সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর উপস্থাপনায় সেকালের সাপেক্ষে নতুনত্ব আছে। তবে রামমোহনের সামগ্রিক চর্চায় এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিরল নয়।

রামমোহন এসব রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয়েছেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী বয়ানের অংশ হয়ে। বঙ্গীয় রেনেসাঁ এবং আধুনিকতার ধারণা এ বয়ানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাংলাদেশের প্রভাবশালী জাতীয়তাবাদী বয়ানে উনিশ শতকের কলকাতায় উৎপাদিত নতুন 'বাঙালিত্বে'র ধারণার সাথে সামঞ্জস্যবিধানের জোর চেষ্টা আছে। তার প্রধান চরিত্র অবশ্য রামমোহন নন, বরং মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু প্রসঙ্গটি যখন আধুনিকায়ন ও নবজাগরণের সাথে যুক্ত হয়, তখন রামমোহন স্বভাবতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। এদিক থেকে স্থান ও কালের ভিন্ন বাস্তবতায় রামমোহনের রচনা ও তৎপরতা যে বাংলাদেশে কোনো নতুন তাৎপর্যে পঠিত হয়েছে, তা নয়। বরং

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কলকাতায় উৎপাদিত বয়ানের নিষ্ক্রিয় ভোক্তা হয়েই লেখকগণ রামমোহন-চর্চা করেছেন।

বর্গ হিসেবে 'আধুনিকায়ন' এসব বয়ানে খুব গোড়ার ভূমিকা পালন করেছে বলেই অধিকাংশের আলোচনায় খুব বড় হয়ে উঠেছে 'প্রগতি-প্রতিক্রিয়া'র বৈপরীত্য। বলা যায়, অধিকাংশ আলোচকই রামমোহনকে পড়েছেন নিকষ কালো অন্ধকারের বিপরীতে আলোকবর্তিকা হিসেবে। ভিন্নমত পাওয়া গেছে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের ক্ষেত্রে, যিনি খোদ নবজাগরণ ও আধুনিকায়ন — দুই ধারণা বাতিল করার ভেতর দিয়ে রামমোহনের সমালোচনা করেছেন। অন্য ভিন্নমতাবলম্বী বদরুদ্দীন উমরের সমালোচনার উৎস তাঁর মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এক্ষেত্রে কলকাতায় চল্লিশের দশকে মার্কসবাদীদের একাংশের মধ্যে বিকশিত দৃষ্টিভঙ্গির অনুগামী হয়ে উমর নবজাগরণ এবং রামমোহন-সম্পর্কিত বহু দাবি খারিজ করেছেন, যদিও এসব বিবেচনায় তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক তৎপরতাও ভূমিকা রেখেছে।

৩.২

বাঙালি মুসলমানের রামমোহন-চর্চায় অধিকাংশের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, রামমোহনের মুসলমানি ও ইসলামি সংশ্লিষ্টতাকে তুলনামূলক 'অতিরিক্ত' প্রাধান্য দেওয়া। এ বৈশিষ্ট্য এমনকি ঘোষিতভাবে 'সেকুলার' বা ধর্মের ব্যাপারে উদাসীনদের মধ্যেও দেখা যায়। গোলাম মুরশিদ (২০১৩: ৩৫) রামমোহনের মুসলমান পাচকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেননি যে, ইউরোপীয়সহ ভারতীয় অভিজাতদের মধ্যে এটা খুবই স্বাভাবিক চর্চা ছিল। রামমোহন রায়ের সামগ্রিক চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের উপর ইসলামি প্রভাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ। *মিরাত-উল-আখবারে* গ্রিসের স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রসঙ্গে রামমোহন তুর্কিপক্ষকে সমর্থন করে লিখেছিলেন — এ ঘটনাকে তিনি দেখেছেন রামমোহনের উপর মুসলিম-প্রভাব হিসেবে (Ahmed 1976: 104)। 'বাঙালির সংস্কৃতিতে নারী' শীর্ষক এক প্রবন্ধে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী জানিয়েছেন, "তিনি [রামমোহন রায়] পূর্বের মুসলিম আমলকে তমসার কাল মনে করেন; ব্রিটিশ সম্রাটকে লিখিত এক পিটিশনে তাঁকে 'পিতা ও ত্রাণকর্তা' (Father and Protector) বলে উল্লেখ করেন।" (উদ্ধৃত, ওয়াকিল ২০০৪: ১৭)

মুসলমানি ও ইসলামি উপাদানগুলোকে 'গুরুত্ব' দিয়ে রামমোহন পাঠের এ ধারা অবশ্য কাজী আবদুল ওদুদেই চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। মূল কোরান পাঠ করেই রামমোহন একেশ্বরবাদের ধারণা লাভ করেছিলেন — ভাষ্যকারদের এ দাবি ওদুদ কেবল মেনেই নেননি, অনেকগুলো উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলামি ধারণার সাথে রামমোহনের ধারণার আক্ষরিক সাদৃশ্য দেখিয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর দাবি

এখানেই শেষ হয়নি — 'যুক্তিবাদ, উদার-মানবতা এইসব মহামূল্য সম্পদও যে পার্সী ও আরবী সাহিত্যভাণ্ডার থেকে' রামমোহন আহরণ করেছিলেন, ওদুদ তাও জানিয়েছেন (১৯৯০: ৩)। 'বিশ্বমানবের একত্বের ও মৈত্রীর ভাবনা' ওদুদের মতে (১৯৯০: ২৯), রামমোহনের মহত্তম অর্জন; আর এ ভাবনার দিক থেকে পারসিক কবি সাদি ও রুমির গভীর প্রভাব রামমোহনের উপর পড়েছিল বলেই ওদুদের সিদ্ধান্ত।

ওদুদের এ দৃষ্টিভঙ্গি এবং বর্ণনা-পদ্ধতির সাদৃশ্য পাওয়া যায় রহমান হাবিবের (২০১০) গ্রন্থে। *রাজা রামমোহন রায়: দর্শন ও ধর্মচিন্তা* বইয়ের প্রায় প্রতিটি অধ্যায়-উপাধ্যায়ে ইসলামি উৎসের উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে, এবং তার সাথে রামমোহনের সংশ্লিষ্ট রচনার আক্ষরিক বা প্রায়-আক্ষরিক সাযুজ্য দেখানো হয়েছে। এ বইয়ের দাবিটি অবশ্য আরো গভীরভাবে 'ইসলামি'। এ অর্থে যে, একেশ্বরবাদকে জগতের স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবে দাবি করে এ গ্রন্থে ভারতীয় ধর্মদর্শনের পরিসরে তার প্রতিপাদনের জন্য রামমোহন রায়কে বিশেষ কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে।

মুশকিল হল, রামমোহনের মুসলমান-সংশ্লিষ্টতার কথা বিপুলভাবে উল্লেখিত হলেও তাঁর কর্মমুখর জীবনের বছরগুলোতে ইসলাম বা মুসলমান-প্রসঙ্গ কেন প্রায় সম্পূর্ণ গরহাজির, সে প্রশ্ন আলোচনাগুলোতে সাধারণভাবে উত্থাপিত হয়নি। কাজী আবদুল ওদুদ (১৯৮৩: ২০৪) আফসোস করে লিখেছেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমান-শাস্ত্র সম্বন্ধে যে-সব সুসম্বন্ধ ও বিস্তৃত আলোচনা তিনি [রামমোহন] করেছিলেন, বা করবেন আশা করেছিলেন, তার কিছুই আমাদের হাতে এসে পৌঁছোয় নি।' কিন্তু রামমোহনের নিজের দিক থেকে বা তাঁর সমকালীন ও পরবর্তীদের দিক থেকে সামষ্টিকভাবে 'না-পৌঁছানো'র কারণটা কেন ঘটল, সে সম্পর্কে তিনি কোনো প্রশ্ন তোলেননি। প্রশ্নটি মৃদুভাবে উত্থাপিত হয়েছে গোলাম মুরশিদের লেখায় (২০১৫: ১১৩): 'অজ্ঞাত কারণে ইসলাম সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ধীরে ধীরেহ্রাস পায়। হতে পারে, তাঁর পরিচিত নাগরিক সমাজে তিনি ইসলামের জ্যান্ত অস্তিত্ব তেমন দেখতে পাননি।'

সুদীপ্ত কবিরাজ লক্ষ করেছেন:

> In the age of Rammohan Roy (1774–1833), cultivation of an upper-class Bengali included a mandatory initiation into Islamic culture and a fluent grasp of Persian. By the time of Rabindranath Tagore (1861–1941), roughly a century later, literary high culture had gone through a striking conversion to become a more solidly Hindu sphere. (Kaviraj 2003: 531)

প্রাথমিকভাবে মন্তব্যটি ঠিকই আছে। তবে রামমোহনের কাল না বলে এখানে তাঁর শৈশব-কৈশোরকাল বলাই শ্রেয়; আর 'হিন্দু স্ফিয়ার' না বলে 'পশ্চিমায়িত হিন্দু

স্ফিয়ার' বললে পরিস্থিতিটা আরো নিখুঁতভাবে বর্ণিত হতে পারে। রামমোহনের স্থায়ীভাবে কলকাতায় আসার আগেই কলকাতার প্রভাবশালী আবহ থেকে মুসলমানি উপাদানগুলো দ্রুত অপসৃত হয়েছিল। প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীর 'অপর' হিসেবে মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠার একটা গভীর প্রক্রিয়া চলমান ছিল (মোহাম্মদ আজম ২০১৯: ১৫৪-৬২)। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে সামনে ছিল খ্রিস্টধর্মের সাথে নব্যশিক্ষিত হিন্দু তরুণদের আপসরফার প্রসঙ্গ। স্থানিক-কালিক ওই বাস্তবতায় মুসলমানি সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ দিকগুলো রামমোহনের চর্চায় থাকার আর কোনো কারণ ছিল না। বাঙালি মুসলমানের রামমোহন-চর্চায় এ আলোচনাটা যে প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থেকেছে, তার প্রধান কারণ, তাঁদের অধিকাংশই রামমোহনকে দেখেছেন ব্যক্তি হিসেবে — পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে স্থাপন করে নয়। বস্তুত, রামমোহন রায়, তাঁর কালের আর দশজনের মতো, কাজ করেছিলেন এক প্রচণ্ড বাস্তবতার মধ্যে এবং নিয়ন্ত্রণে। সে বাস্তবতার নাম উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া।

৩.৩

আমাদের আলোচিত রচনাগুলোর একাংশ পড়লে বোঝার কোনো উপায় থাকে না যে, রামমোহন রায় কাজ করেছিলেন ঔপনিবেশিক শাসনের বজ্র-আঁটুনির মধ্যে। অপর একাংশ ঔপনিবেশিক শাসনকে দেখেছেন 'ইংরেজ শাসন' হিসেবে, যার প্রত্যক্ষ ফল 'আধুনিকায়ন'। বদরুদ্দীন উমর ঔপনিবেশিক শাসন এবং তার আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাকে মূল্য দিয়েছেন; তবে ওই 'যুগসত্যে'র মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্তাসত্তা যেভাবে ক্রিয়াশীল ছিল, তাকে বিবেচনায় আনেননি। বিপরীতে অন্য অনেকে ব্যক্তিকে এতটাই স্বাধীনসত্তা দিয়েছেন যে, যুগের আবহ তাতে আঁচড় কাটতে পারেনি। এ তালিকায় কাজী আবদুল ওদুদও পড়বেন। ওদুদের ক্ষেত্রে অবশ্য কথাটার অন্য গুরুতর তাৎপর্য আছে। তাঁর লিবারেল ডিসকোর্সে ব্যক্তির মধ্যে 'অগ্রসর' ধ্যান-ধারণার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। অন্যদের মধ্যে সে ধ্যান-ধারণার সঞ্চারই তাঁর কাছে প্রগতির উপায়। রামমোহন রায়কে তিনি সেভাবেই আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, এবং মহিমান্বিত ভাব ও তৎপরতায় চিহ্নিত করেছেন।

কিন্তু কলকাতার গত প্রায় পঞ্চাশ বছরের চর্চায় উপনিবেশ আমলকে দেখার নতুন-সব দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভি. সি. জোশি সম্পাদিত *Rammohun Roy and the Process of Modernization in India* [1975] বইয়ের উল্লেখ করা যায়। রেনেসাঁসের প্রবক্তা রামমোহন নাকি অন্য কেউ, কিংবা এর মাহাত্ম্য বা ঊনতা কতটা — সেই বিচারের পরিবর্তে এ বইয়ের প্রবন্ধগুলোতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ওই কালের পরিস্থিতিকে, যা এর মুখ্য নিয়ন্ত্রক। ব্যক্তির কর্তাসত্তার গড়ন ও কার্যকরতার ধরনের দিকেও সমান নজর রাখা হয়েছে, যেন,

উপনিবেশায়ন বিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রক ও একমাত্র সক্রিয় সত্তা হয়ে স্থানীয় সক্রিয়তাকে মুছে না দেয়। রণজিৎ গুহ, অশোক সেন, বরুণ দে, সুমিত সরকার, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপেশ চক্রবর্তী, দেবেশ রায়, গৌতম ভদ্র, আশিস নন্দী, সুদীপ্ত কবিরাজ প্রমুখ ঐতিহাসিকের সংশ্লিষ্ট কাজ একেবারে সমধর্মী না হোক, পরস্পর-সম্পর্কিত একটা প্রতাপশালী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে। বাঙালি মুসলমানের রামমোহন-চর্চায় তার প্রভাব খুব একটা পড়ে নাই বলেই মনে হয়। আমাদের আলোচিত রচনাগুলোর মধ্যে কেবল সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর রচনাটিতে সমধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির আংশিক সাযুজ্য চোখে পড়ে।

৪

বাঙালি মুসলমানের রামমোহন-চর্চার পরিধি খুবই ছোট। তাহা ইয়াসিন (২০১৯) *নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন রায়* নামে যে সংকলন সম্পাদনা করেছেন, তাতে অন্তত তিরিশটি প্রবন্ধ ও গ্রন্থাংশ সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদ ছাড়া বাঙালি মুসলমানের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। রামমোহনের মতো এমন বড় ব্যক্তিত্ব নিয়ে চর্চার এই ঊনতার কারণ নির্দেশ করা সহজ নয়। তবে কয়েকটি অনুমান করা যেতে পারে।

এক. বাঙালি মুসলমানের চর্চা অনেক বেশি সাহিত্য-নির্ভর। সাহিত্যের আওতায় রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম ও মধুসূদন তো বটেই, এমনকি বিদ্যাসাগরকে যত সহজে স্থাপন করা যায়, রামমোহনকে তত সহজে যায় না। কেবল গদ্যের আলোচনায় তিনি গুরুত্ব পেতে পারেন। কিন্তু তাঁর গদ্যভঙ্গির সাথে পরবর্তী জমানার বিচ্ছেদ তৈরি হওয়ায় সে কাজটাও খুব সহজ হয় না। দুই. বাঙালি মুসলমান উনিশ শতককে পাঠ করে প্রধানত আধুনিকায়নের দিক থেকে – প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার বাইনারিতে। ধর্ম-সংশ্লিষ্ট তৎপরতা সে কাঠামোর মধ্যে প্রায়ই হাজির হয় 'প্রতিক্রিয়া'র কোটায়। রামমোহনের দর্শনচর্চা মুখ্যত ধর্মচর্চার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে। অগ্রাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে এ বাস্তবতা একটা মনস্তাত্ত্বিক বাধা তৈরি করতে পারে। উল্লেখ্য, ধর্মের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের তুলনামূলক নিরাসক্তি বাঙালি মুসলমান ব্যাপকভাবে উদযাপন করে থাকে। তিন. কলকাতার উনিশ শতককে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমান আত্মস্থ করেছে মুখ্যত জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণার অনুষঙ্গ হিসেবে। ওই ধারাপ্রবাহে রবীন্দ্রনাথ যেমন জীবন্ত চরিত্র ছিলেন, রামমোহনের ক্ষেত্রে তার তুল্য কিছু ঘটেনি। একজন ভাষ্যকার বাঙালি মুসলমানের রবীন্দ্র-লিপ্ততাকে বর্ণনা করেছেন 'রক্তের দাগ মুছে রবীন্দ্রপাঠ' হিসেবে (ফরহাদ ২০০৮)। প্রত্যক্ষ বাস্তবতার টানাপড়েনে রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয়তাবাদী বয়ানে যেরকম প্রাত্যহিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, রামমোহন রায়ের অবস্থিতি তা থেকে মেরুদূর। স্মরণ করা যেতে পারে, রামমোহনের ক্ষেত্রে

কলকাতার জাতীয়তাবাদী বয়ানেও এ ধরনের দূরত্বের কথা জাহির আছে। কাজী আবদুল ওদুদ অন্য অনেকের বর্ণনায় প্রচারিত এ দূরত্বের ব্যাপারে বহুবার আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। তবে কলকাতার জাতীয়তাবাদী বয়ানে রামমোহনের ওই দূরত্ব ছিল মুখ্যত তাঁর ইঙ্গবাদী অবস্থান এবং ধর্মপ্রশ্নে তাঁর অবস্থানের কারণে। বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানের ক্ষেত্রে দূরত্বের কারণটা একেবারেই ভিন্ন ঘরানার।

সর্বোপরি, পাঠ-তৎপরতা ও চর্চার সাংস্কৃতিক গরিবিকেও রামমোহন-চর্চার ঊনতার কারণ হিসেবে ভাবা চলে। বলা যায়, মহামহিম চরিত্র হিসেবে বাঙালি মুসলমানের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর স্মৃতিতে রামমোহনের যে প্রতিষ্ঠা, তার গড়ন মিথধর্মী, চর্চার প্রযত্নে প্রাত্যহিক হয়ে ওঠা প্রতিকৃতি নয়।

সহায়কপঞ্জি

আহমদ ছফা, ২০০০। *যদ্যপি আমার গুরু* (৩য় মুদ্রণ), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

এনামুল হক, সালবিহীন। 'রামমোহন রায়ের ধর্মচিন্তা: প্রেক্ষাপট সমাজ সংস্কার', অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, Dhaka University Institutional Repository-তে প্রাপ্তব্য।

ওয়াকিল আহমদ, ২০০৪। 'রামমোহন রায়: একটি ব্যক্তিত্ব', *বাংলার রেনেসাঁ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা।

২০০৪। 'বাংলার রেনেসাঁ', *বাংলার রেনেসাঁ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা।

কাজী আবদুল ওদুদ, ১৯৮৩ [১৯৫১]। *শাশ্বত বঙ্গ*, ব্র্যাক প্রকাশনা, ঢাকা।

১৯৯০ [১৩৬৩]। *বাংলার জাগরণ*, *রচনাবলী ২য় খণ্ড*, আবদুল হক সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১৯৯০ক [১৩৬১]। 'তুহ্ফাতুল মুওহ্হিদীন', *রচনাবলী ২য় খণ্ড*, আবদুল হক সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

কামরুল ইসলাম, ২০১৯ [২০১৭]। *আধুনিক বাঙালি রামমোহন রায়*, চিত্রা প্রকাশনী, ঢাকা।

২০১৯। *রামমোহন রায়: সমাজ ও সাহিত্য*, বাংলাপ্রকাশ, ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ, ২০১৩ [২০০৮]। *কালাপানির হাতছানি: বিলেতে বাঙালির ইতিহাস* (৩য় মুদ্রণ), অবসর, ঢাকা।

২০১৮ [২০০৬]। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (দশম মুদ্রণ), অবসর, ঢাকা।

২০১৫। *রেনেসন্স: বাংলার রেনেসন্স*, অবসর, ঢাকা।

তাহা ইয়াসিন সম্পাদিত, ২০১৯ [২০১৬]। *নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন রায়*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা।

ফরহাদ মজহার, ২০০৮। *রক্তের দাগ মুছে রবীন্দ্রপাঠ*, আগামী, ঢাকা।

বদরুদ্দীন উমর, ২০১৬ [১৯৭৪]। *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ*, সুবর্ণ, ঢাকা।

মোহাম্মদ আজম, ২০১৯ [২০১৪]। *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*, আদর্শ, ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, ১৯৯৭ [১৯৫৬]। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত: আধুনিক যুগ* (৮ম সংস্করণ), আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।

রহমান হাবিব, ২০১০। *রাজা রামমোহন রায়: দর্শন ও ধর্মচিন্তা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ২০০২। *উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ, নির্বাচিত সাহিত্যসমালোচনা গ্রন্থভুক্ত*, মৌলী প্রকাশনী, ঢাকা।

Ahmed, A. F. Salahuddin, 1976 [1965]. *Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835*, Rddhi, India.

Ghosh, Anindita, 2006. *Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language and Culture in a Colonial Society, 1778-1905*, Oxford University Press, New Delhi.

Joshi, V. C. edited, 1975. *Rammohun Roy and the Process of Modernization in India*, Vikas Publishing House Pvt Ltd, Delhi

Kaviraj, Sudipta, 2003. 'The Two Histories of Literary Culture in Bengal', in *Literary Cultures in History: Reconstructions from South Asia*, Edited by Sheldon Pollock, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London.